হার মানা হার

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

'আজ গুড-ফ্রাইডে। ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরী সব বন্ধ। এর পর শনি-রবি দু'দিনই ছুটি। অখন্ড অবসর। কোথাও গিয়ে যে একটু ঘুরে আসবে, তারও উপায় নেই। হস্টেলের গন্ডি ছেড়ে বাইরে বেরুনোই নিষিদ্ধ! তন্মধ্যে কি সাংঘাতিক গরম। উফ্ঃ, অসহ্য! হস্টেলের চার-দেওয়ালের বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হবার যোগার। গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। একটু হাওয়া নেই, বাতাস নেই, পশু-পাখীর কলোরব নেই। গাছের একটা পাতা পর্যন্তও নড়ছে না। যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীটা। সকাল, না সন্ধ্যে, মালুমই হচ্ছে না। ধুৎত্তোরি, এরকম ওয়েদার ভালো লাগে কারো! বিচ্ছিরি!'

মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে আসে জয়ন্তি। গিয়ে দাঁড়ায় ব্যালক্নিতে। তবু শান্তি পায় না। বড্ড অস্বস্তিবোধ করে। ক্ষীণ আবছা অন্ধকারে কিচ্ছু ভালো লাগছে না। ক'দিন যাবৎ মনটা কেমন আনচান করে উঠছে। আবার কখনো কখনো এক ধরণের শূন্যতাবোধে বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই ও' স্বস্তি পাচ্ছে না।

হস্টেলের পিছন দিকটা বেশ শান্তিপূর্ণ, নিরিবিলি জায়গা। অফ্ পিরিয়েডে কিম্বা ছুটির দিনে হস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা উন্মুক্ত নীল শামীয়ানার নীচে নিঝুম পরিবেশে গভীর মনোযোগ সহকারে বসে বসে পড়াশোনা করে, গল্পের বই পড়ে। কেউ কেউ অবকাশ যাপনে দলবদ্ধভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে গল্প-গুজব করে, আড্ডা দেয়। কিন্তু আজ পালা করে সবাই ব্যাট্‌মিন্টন খেলছে। দেখতে দারুণ লাগছে জয়ন্তির। বিশাল জায়গা। বিস্তর প্রান্তর জুড়ে রোজ-গার্ডেন। গার্ডেনের চারিধারে সারি সারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছ। হস্টেলের চারতলা থেকে দেখে মনে হচ্ছে, গাছগুলি লাল আর হলুদ ফুলে আবৃত হয়ে আছে। গাছের পাতাগুলি ঝুরু ঝুরু মিহিন বাতাসে এলোপাথারি দুলছে। গার্ডেনের এক কোণায় নায়গ্রার জলপ্রপাতের মতো শন্‌শন্ শব্দে প্রবল বেগে অনবরত বইছে ঝর্ণার জল। হঠাৎ সেই শন্‌শন্ শব্দের প্রতিঃধ্বনীতে এক শূন্য নিবিড় নিস্তব্ধতায় গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যায় জয়ন্তি। ওর যেদিকে দুচোখ যায় সর্বত্রই যেন এক অভিনব বৈচিত্র্যের সমাহার, অভিনবত্বের পসরা। যা দ্যাখে সবই নতুন লাগে, সুন্দর লাগে। সমগ্র পৃথিবীটাই যেন এক অভাবনীয় বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে ঘেরা, অপূর্ব! সে এক অনবদ্য আনন্দ উপভোগ করবার মতোই একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য। যার চারিধারে এক বর্ণনাতীত ভালোলাগার উপাদানে আচ্ছাদিত এবং সমৃদ্ধ।

বিস্ময়ে অভিভূত জয়ন্তি উন্মুক্ত অন্তর মেলে আস্বাদন করতে থাকে, দিগন্তের সবুজ প্রান্তর জুড়ে পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত সূর্য্যের কুসুম আলোয় ভেসে ওঠা প্রকৃতির চমকপ্রদ রূপ, রং আর সৌন্দর্য্য। কল্পনায় বিচরণ করে, এক শূন্য নিবিড় নির্জন ভুবনে। যেন স্বর্গোদ্যান! আহা, কি নিদারুণ কোমল সেই অনুভূতি। ছুঁয়ে যায় ওর হৃদয়পটভূমি। শীতল হয়ে আসে হৃদয়-মন-প্রাণ, সারাশরীর। আত্মমুগ্ধতায় ওকে একেবারে চুম্বকের মতো আবিষ্ট করে রাখে। চোখের পলক পড়ে না। আর সেই একটানা তীব্র ভালোলাগা আর মুগ্ধতার আমেজ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ওর দেহে এবং মনে। জমে ওঠে হাজার প্রশ্নের ভীঁড়। সে এক ব্যাখ্যাতীত ভাবনার উৎপত্তি হয় ওর মস্তিস্কের মধ্যে। কিছুতেই ভেবে কূল পায় না, ওতো প্রায়শঃই ব্যালক্নিতে দাঁড়িয়ে রোজ-গার্ডেন অবলোকন করে। নজর বুলিয়ে গার্ডেনের চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করে। কোন কোনদিন গার্ডেনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। বসে বসে গল্পের বই পড়ে। কই, কখনো তো এমন অনুভূতি জাগ্রত হয়নি। এমন ভাবান্তর আগে কোনদিন তো হয়নি। প্রতিদিনই তো সকাল হয়, দূপুর আসে। তারপর গোধূলী এবং সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে রাত আবার ফিরে চলে যায় ভোরে। ঊষার প্রথম সূর্য্যের স্নিগ্ধ কোমল নির্মল আলোয় দিগন্ত জুড়ে বিকশিত করা একটি নতুন সকালে। আবার সব সকাল, দূপুর, সন্ধ্যে এবং রাত কখনো এক হয়না। তরুণ তাপসের মতো কখনো উজ্জ্বল রৌদ্রখরদীপ্ত সোনালী আকাশ, কখনো ম্লান, কখনো বা ধোঁয়াটে। এতে মানব মনেও প্রভাব পড়ে, প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবনকেও করে নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির সাথে মানব মনের এ এক নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু তাতে কখনো কিছুই এসে যায়নি জয়ন্তির। মুহূর্তের জন্যও ওর মনকে কখনো মলিন ম্রিয়মান করেনি। কোনো প্রতিক্রিয়াই ওর মধ্যে দেখা দেয়নি। বরং ওতেই ও' বিলীন হয়ে যেতো। ও'তো বরাবরই নিরবিচ্ছিন্ন একাকী সন্ধ্যায় ঘরের কোণে নিঃভৃতে নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় একলা থাকার ভালোলাগাটুকুই শুধু একান্তে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল। গহীন অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। তাতেই ছিল ওর সুখ, আনন্দ। এতকাল তা-ই হয়ে এসেছে। অথচ আজকের দিনটা সকাল থেকে কেমন নীরব, নিরুচ্ছাস, বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সূর্য্য

দর্শর্ণের কোনো সম্ভবনাই নেই। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। গোধূলীর পূর্বেই ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। মনে হচ্ছে, এক্ষুণি ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামবে। অথচ কি আশ্চর্য্য, আজ সেই একাকী সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ বিষন্নময় জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ক্রমশ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে জয়ন্তি, বিচলিত হয়ে ওঠে। সবুর সয়না ওর। খাঁচার বন্দী পাখীর মতো মনটা ওর কেবলই ছটপট করতে থাকে।

হঠাৎ অভাবনীয় ভাবনার জাল বুনতে বুনতে এক সীমাহীন ইচ্ছানুভূতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় জয়ন্তি। খুঁজে পায়, জীবনের প্রকৃত অর্থ। আবিস্কার করে, বেঁচে থাকার সাধ। একটি নতুন উপকরণ। আজ যেন প্রকৃতিতেই সম্পূর্ণ বিসর্জিত। নিয়তির কাছে আত্ম সমর্পিত, স্বপ্নের কাছে ধরাশায়ী, মন-বাসনার প্রকোষ্টে কারাবন্দি। যেন নিবেদিত প্রাণ। মন-মানসিকতার কি অদ্ভুদ বৈপরীত্য জয়ন্তির! ইচ্ছে করছে, শূন্য গগনে উড়ে যাওয়া একঝাঁক মুক্ত-বিহঙ্গের মতো দূর নীলিমায় হারিয়ে যেতে, পুর্ণোদ্যামে খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াতে। আরো কত কি!

ভিতরে ভিতরে সেই ভালোলাগার মধুর আবেশ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় জয়ন্তির। টের পায়, মনের মধ্যে রস সঞ্চার হবার একটা তীব্র অনুভূতি। কি নিদারুণ একটা শিহরণ! রক্তের স্রোতের মতো ক্রমশ ওর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। শুনতে পায় প্রাণস্পন্দন। যা কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। বিকশিত করে। আর সেটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে জয়ন্তি বেমালুম হারিয়ে যায়, এক অভাবনীয় কল্পনার সাগরে, এক স্বপ্নময় জগতে। যেদিন শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করে, এক অভিনব কোমল অনুভূতি। আর তৎক্ষণাৎ শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঝোরে গিয়ে সদ্য প্রষ্ফূটিত ফুলের মতো ও' চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতো পুলক জাগা শিহরণে দোল খায় ওর হৃদয়-মন-প্রাণ-সারাশরীর। চোখমুখ থেকেও ঝোরে পড়ে উচ্ছাস, আবেগ। অব্যক্ত ভালোলাগার মধুর আবেশে হঠাৎ স্বগতোক্তি করে ওঠে, -'এর নামই কি ভালোবাসা! ভালোবাসায় এতো সুখ, এতো আনন্দ! তবে কি সত্যিই প্রফেসার শুভেন্দুর প্রেমে পড়ে গেল না কি ও'!'

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, মায়ের সাথে ওর তুমুল বাকযুদ্ধ, মতান্তর, আপত্তি, বিরোধীতা। যেদিন শ্রুতিকটূ বাক্যের তীর ছুঁড়ে মনুষ্যজাতির চিরাচরিত রীতি-রেওয়াজ, দু'টি মানব-মানবীর পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ়তার সাথে অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করে বলেছিল,-'কর্তব্যের দোহাই দিয়ে সামাজিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানেই মেয়েদের একান্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বির্সজন দেওয়া, অন্যের বশ্যতার স্বীকার হওয়া, করুণার পাত্রী সেজে অন্যের পদতলে আত্মসমর্পন করা, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করা, নিরন্তর বোঝা পোড়া, নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ্যে বয়ান করা, নিজেকে অবমাননা করা। যার ফলসরূপ দুঃখের দহনে করুণ রোদনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করা, নিঃশ্ব হয়ে যাওয়া। শুধু তা নয়, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিশ্বস্থতা, আস্থা এবং সামঞ্জস্যতারও একটা ব্যাপার আছে। যা নিতান্তই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে আমরণ অটুট থাকে, বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ এবং ভালোবাসা। তা না হলে ভিত্তিহীন, আবেগ-অনুভূতিহীন দাম্পত্য জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষতে কষতেই অবলীলায় একদিন নীরবে অনাদরে অবহেলায় ঝড়ে যাবে একটি মাসুম জীবন। সেটাই কি তুমি চাও মামনি! না, না এ হতে পারেনা, কিছুতেই না। রক্তে-মাংসে গড়া মানবীয় হয়ে, আপন সত্ত্বা হারিয়ে, সূঁতোয় বাঁধা অবলা কাঠপুতুলের মতো নীরবে নির্বিবাদে এই ছলনাময় সংসারে বেঁচে থাকা, এ আমি পারবো না, কক্ষনো না, কিছুতেই না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একজন অচেনা অজানা অপরিচিত পুরুষমানুষের গলায় আমায় মালা দিতে বোলো না মামনি!'

গর্জে উঠলেন সুধাময়ী,-'এসব তুমি কি বলছ জয়া! সব মিথ্যে, তোমার ভুল ধারণা! পৃথিবীর সব মানুষ, মানুষের রুচী, মনোবৃত্তি সমান নয়। যদি তাই-ই হোত, তবে বহুকাল আগেই সংসার নদীর প্রবাহ থেমে যেতো। বংশ বিস্তার লোপ পেতো। পৃথিবীর জন-মানব শূন্য হয়ে যেতো। জীবনে কোনদিনও মানুষ বড় হতে পারতো না। মানুষের জীবন এতো উন্নতমানের হোত না। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যও কখনো এতোখানি বৃদ্ধি পেতো না। জীব সৃষ্টির সাথে সাথে জীবন ধারণের নানা উপকরণ এবং ভোগের কৌশল সৃষ্টিকর্তা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে অনাগত দুঃখ-যন্ত্রণা দূরীভূত করার বহু পন্থাও সৃষ্টি করে রেখেছেন। এতোখানি পড়াশোনা করে এটাই কি শিখলে তুমি!'

অসন্তোষ গলায় বললেন,-'রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে পড়তে মাথাটা তোমার একেবারেই গেছে। সারাদিন রিসার্চ করো। বাস করো ভিন্ন জগতে। সেখানে নিজস্বতার প্রাধান্যে নিজের কর্মসূচীকে এতবেশী গুরুত্ব দাও, পৃথিবীর অন্য কিছু আর তোমার নজরে পড়ে না। তাই বুঝতে পারো না। প্রত্যেক জিনিসের একটা বৈপরীত্য আছে, প্রতিঃদ্বন্দিতা আছে এবং থাকবেও। বিশেষতঃ মনুষ্য জীবনে। সাধারণতঃ মানুষের জীবন কখনো একইধারায় প্রবাহিত হয় না। নদীর জোয়ার ভাটার মতো সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন। শরীর থাকলে ব্যথা-বেদনা থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। তাকে রোধ করা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন সৃষ্টির অমোঘ নিয়মেই ঘটে আবহাওয়ার পরিবর্তন। যখন ধরিত্রীর বুকে নেমে

আসে কালো মেঘের ছায়া, কখনো প্রচন্ড তাপদাহে ঝলসে ওঠা প্রখর রোদ্দুর, কখনো বা প্রবল বেগে ছুটে আসে ঝড়-বৃষ্টি-তুফান। তেমনি মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, হাসি-কাঁন্না অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। তুমি ভেবো না, সংসার জীবনের পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করবে, জীবনকে নিজের ইচ্ছা মতো পরিচালনা করবে, দিক নির্ণয় করবে, সেটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতী, তথা প্রতিটি নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, প্রেরণা শক্তি, শক্তির উৎস। বিশেষতঃ দাম্পত্য জীবনে। সেই সঙ্গে বিধাতার দান সরূপ বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান, নারী-পুরুষ সবার অন্তরেই ভক্তি-শ্রদ্ধা, আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা সমানভাবেই বিদ্যমান। শুধু তফাৎ এইটুকুই, কারো প্রকাশ পায়, কারো পায় না। এই ভবের সংসারে মানুষ ভালোবাসা ছাড়া কখনোই বাঁচতে পারে না। যা অন্ন-বস্ত্রের মতো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্তই প্রয়োজন। আর মানুষকে ভালোবাসা, স্নেহ করা, শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, এ তো মনুষ্যজাতির পরম ধর্ম। আর সেই মনুষ্য কূলের তুমিও একজন সদস্য। এর উর্দ্ধে তো তুমি নও জয়া!'

কথাটা মনে পড়তেই ঠোঁটদুটো চিপে অস্ফূট হেসে ফেলল জয়ন্তি। শ্বাশত লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে চোখদু'টি রাঙা ওর হয়ে ওঠে। একেলা নিরবিচ্ছিন্ন নির্জন সন্ধ্যায় ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যায় স্মৃতি রোমন্থনে।

(দুই)

ছোটবেলা থেকেই জয়ন্তি যেমন একরোখা, ধীর-স্থীর-গম্ভীর, তেমনি বিদ্রোহী গোছের মন-মানসিকতা। প্রতিটি ব্যাপারে ওর আপত্তি, অভিযোগ, বিরোধীতা। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েই সাংঘাতিক চটে যেতো। একেবারে মিলিটারীদের মতো মেজাজ ছিল ওর। নাকের ডগা দিয়ে একটা মাছি পর্যন্ত কখনো উড়ে যেতে পারতো না। বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমণীয় ওর জেদ। বিবাহ সে কখনোই করবে না। অথচ সর্বদা নিজের ইচ্ছা এবং চাহিদা হাসিল করে নেওয়াই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বিশেষ করে সৃষ্টিশীলতার তাগিদে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, অন্যের করুণায় নির্ভরশীল হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, সেটা ও' কখনোই সমর্থন করতো না। কিন্তু অধ্যাপক পিতা-মাতার শাসন শিক্ষায় বেড়ে ওঠা জয়ন্তির মূল উদ্দেশ্য এবং আর্দশ, জীবনে বড় হওয়া, সৎ হওয়া এবং মহৎ হওয়া। চেয়েছিল, মাতা-পিতার স্নেহ-মমতার ছত্রছায়া থেকে সড়ে এসে নিজস্ব মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে, উচ্চপদ মর্যাদাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, স্বাবলম্বী হতে। চেয়েছিল, নিজের মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান বজায় রেখে বন্ধনহীন, চিন্তাহীন, মুক্ত-বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে জীবনের সমগ্র জটিলতা থেকে নির্ভেজালভাবে বেঁচে থাকতে। পুরুষ শাসিত সমাজে পূর্ণ মান-মর্যাদায় সমান অধিকারের তালিকাভূক্ত হয়ে পুরুষ মানুষের সাথে তালে তাল মিলিয়ে একই পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে। জীবনে কখনো হার মানেনি জয়ন্তি, হার মানতে শেখে নি ও'। ওর একমাত্র আশা-আকাঙ্খা মাতা-পিতার ইচ্ছা ও স্বপ্নকে যথাযথ পূরণ করা, সার্থক করে তোলা, জীবনে সফলতা অর্জন করা। আর সেই উচ্চাকাঙ্খিত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়ীত করতে দৃঢ় মনের অধিকারী জয়ন্তি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে পদার্পণ করে দিলীর জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে। যেদিন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুঠাম সুদর্শণ বুদ্ধিদ্বীপ্ত তরুণ লেক্চারার শুভেন্দুকে ও' প্রথম দেখেছিল। সেখানেই লেডিস হষ্টেলে থেকে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দিবানিশি নিমগ্ন নিরলস হয়ে ডুবে থাকতো বিদ্যার অথৈ সাগরে। হাসি-মশকরা, আনন্দ-কোলাহল, উৎসাহ-উদ্দীপণা কোনদিকেই ওর উৎসাহ ছিলনা, আগ্রহ ছিলনা। একদম নিরস, বেরসিক। অথচ তখন ওর সুকোমল যৌবনের প্রথম প্রহর। যেন বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল যৌবন। কি চমকপ্রদ রূপ, রং, লাবণ্যতা, শরীরের গড়ন। যেন সৌন্দর্য্যের পারিজাত। চির অম্লান, চির সজীব, শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমনীয় নব যৌবন সম্পন্না এক উদ্বিগ্ন অনন্যা। বিধাতা যেন অকৃপণ নিপুণতা ঢেলে ওকে গড়েছিলেন। পূর্ণতায় একেবারে ভরপুর।

কথায় বলে,-'যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপর্শীর ঘুম নেই!'

ভেবে অস্থির হয়ে উঠতো ওর সহপাঠীরা। কেউ কেউ উপহাস করে বলতো,-'বালিকা ব্রহ্মচারী!'
আবার কেউ কেউ ওর রূপের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করতো,-'পরিণত যৌবনে জীবনকে উপভোগ করবার উপযুক্ত সময়ে তারুণ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহত্যাগী সাধু-সন্তদের মতো এতখানি আত্মসংযমী হয় কিকরে! আবেগ অনুভূতিও কি নেই ওর শরীরে? জীবনে কোনো স্পৃহাই কি ওর নেই?

কিন্তু আবেগ-অনুভূতিহীন নিরস নিরুচ্ছাস, নিস্প্রেম জয়ন্তির ধূসর মরুভূমির মতো হৃদয়াকাশেও যে একদিন ভালোবাসার গ্রহণ লাগবে, প্রেমের পত্তন ঘটবে, তা কে জানতো!

সেদিন ছিল ২৫শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস। এ উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সেদিন সকাল থেকেই আনা গোনা শুরু হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে পূর্ণদ্যোমে প্রস্তুতি চলছিল, এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিশাল আয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত। তন্মধ্যে কেউ কেউ চড়ুইভাতির অন্যতম আনন্দে মেতে ওঠে। সুরের মূর্ছণায় গমগম করছে রোজ-গার্ডেন। রেকর্ডে বাজজে রবীন্দ্র সঙ্গীত, কখনো প্রাচীন লোকগীতি। সবাই আনন্দে মর্শগুল। একমাত্র জয়ন্তিই সবার চে' ব্যতিক্রম। একটু ভিন্ন ধরণের। সহজে ধরা দেয় না। বিশেষতঃ বন্ধু মহলে। এমনিই কথা কম বলা ওর অভ্যেস। কোয়াইট থাকতে ভালোবাসে। তন্মধ্যে মহিলাঙ্গনের কোনো ভূমিকা পালন করা কিম্বা দায়িত্ব গ্রহণ করা, আগুন্তক অথিতিদের আদর অভ্যর্থনা করা, তাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করা, সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময় করা, ওসব ওর ধাতে নেই। এককথায় নিজেকে সর্বত্র গুটিয়ে রাখাই ওর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ঠ্য। ব্যক্তিগত রুচীও বলা যায়। পার্শ্বস্থ একটি উঁচু ঢিবির উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে সকলের কান্ড দেখছিল বসে বসে। ইতিপূর্বে প্রফেসার শুভেন্দু কখন যে নিঃশব্দে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ টের পায়নি। তিনি হঠাৎ সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,-'কি, রান্না-বান্না হোল তোমাদের! বেলা সাড়ে তিনটে বাজে, খাওয়া দাওয়া হবে কখন!'

বলতে বলতেই হঠাৎ উঁচু ঢিবির দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে থমকে দাঁড়ান। নিজের চোখদু'টোকে কিছুতেই যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। হাঁ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে জয়ন্তির অভাবনীয় রূপ দর্শণে তিনি পড়ে গেলেন বিস্ময়ের ঘোরে। -এ কি, জয়ন্তি না! আজ ওর হঠাৎ বেশভূষার পরিবর্তন! জিন্সের প্যান্ট-শার্ট বর্জন করে পরিধানে বাঙালি রমণীর চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র তাঁতের শাড়ি! বাহ্, অপূর্ব! সোনালী চওড়া পাড়ের মেরুন রংএর শাড়িতে ওকে অবিকল দূর্গা প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। যেমন দুধসাদা গায়ের রং, তেমনি হরিণাক্ষী দু'টির মায়াবী চাহনি। তন্মধ্যে ওর পৃষ্ঠদেশ জুড়ে লম্বা ঘন কালো কোঁকড়ানো রেশমী চুল। চোখ ফেরাবার সাধ্য কার। প্রতিটি মানুষকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ঠ করবেই। যেন সাক্ষাৎ দেবী, দেবলোকের বাসিন্দা। ভক্তদের আরাধনায় স্বয়ং নেমে এসেছে মর্তে।

স্বাভাবিক কারণেই হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠল ঠোঁটের কোণে। হাসিটা বজায় রেখেই প্রসন্ন হয়ে বললেন,-'তুমি ওখানে কেন জয়ন্তি! এসো এসো, নেমে এসো! আমি তো থাকতেই পারলাম না! কি চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে রান্নার! স্ম্যাল্ গুড্! কেমন টেনে নিয়ে এলো আমায় দ্যাখো তো!'
বলে জয়ন্তির সন্নিকটে এগিয়ে গেলেন। হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে বললেন,-'দেখো সাবধান, বিকেয়ার ফুল! জায়গাটা খুব পিচ্ছল, স্লীপ্ করতে পারে!'

অপ্রস্তুত জয়ন্তি হঠাৎ পড়ে যায় বিপাকে। মনে মনে ইতস্ততবোধ করে, সংকোচবোধ করে। কি করবে, মনস্থির করতে পারে না। অগত্যা, সলজ্জে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই বিদ্যুতের শখ খাওয়ার মতো তৎক্ষণাৎ একটা ঝটকা লাগল ওর সারাশরীরে। কেঁপে উঠল ওর হৃদয়স্পন্দন। স্পর্শকাতরতায় লজ্জাবতী পাতার মতো রাঙা মুখখানা ওর চকিতে নুয়ে পড়ল। প্রফেসার শুভেন্দুর উষ্ণ স্পর্শে কি নিদারুণ কোমল একটা শিহরণ খেলে গেল ওর দেহে এবং মনে। যা ক্ষণপূর্বেও ও' কল্পনা করতে পারে নি। কি অদ্ভুত একটা শিহরণ। রক্তের স্রোতের মতো শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে সঞ্চালণ হতে লাগল, এক অভিনব ভালোলাগার তীব্র অনুভূতি। যার বিশেষণমূলক কোনো ব্যাখ্যা তখন ওর জানা ছিল না। জানা ছিল না, আচমকা বিপরীত লিঙ্গের উষ্ণ স্পর্শে মানসিক অস্থিতিশীলতায় ওর হৃদয়পটভূমিতে তুমুল ঝড় বয়ে যাবে। তোলপাড় করে দেবে, প্রচন্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করবে। ওর তন মন সারাশরীর গহীন ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠবে। হঠাৎ স্যারের প্রতি একটা আকর্ষণ বেড়ে যাবে। একটা অন্তর্নিহিত সম্পর্কের সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার ইচ্ছে জেগে উঠবে। যা কল্পনার অতীত।

মুহূর্তের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তির। রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর কণ্ঠস্বর। অপ্রত্যাশিত প্রফেসার শুভেন্দুর আগমন, উপস্থিতি এবং তাঁর অমায়িক আন্তরিকতার অভিব্যক্তিটুকু ওকে বেশ কিছুক্ষণ বুঁদ করে রেখেছিল। কিন্তু তার অন্তর্নিহীত কোনো তাৎপর্য প্রকাশ্যে ধরা না পড়লেও আচমকা আবেগের প্রবণতায় জয়ন্তি পারেনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। পারেনি, অভাবনীয়ভাবে সাময়িক সঞ্চিত কোমল আনন্দানুভূতিটুকু ধারণ করতে। মুগ্ধ আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে শুধু অনুভব করে, এক অবিচ্ছেদ্য টান, এক অদৃশ্য বন্ধন। যা ক্রমশ ওর আত্মার সাথে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে মনকে ওকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। চোখ তুলে তাকাতেই পাচ্ছিল না। সবিস্ময়ে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করেই শাঁড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে দ্রুত ছুটে চলে যায় হষ্টেলের দিকে। হষ্টেলে ঢুকে নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। শুয়ে শুয়ে আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে কখন যে সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে, ওর খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব মূর্ছণা কর্ণগোচর হতেই শরীরের সমস্ত

ইন্দ্রিয়গুলি ওর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ দ্রুত ফ্রেস হয়ে, ড্রেস-আপ সেড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে অডিটোরিয়ামে। ততক্ষণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। একের পর এক মঞ্চস্থ হচ্ছিল, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, কাব্য-জলসা এবং কবিতার আসর। সব মিলিয়ে অত্যন্ত চমকৃতভাবে সমগ্র কলা-কুশলীদের দুর্দান্ত পরিবেশনায় সমগ্র দর্শক-শ্রোতাদের যখন চুম্বকের মতো আবিষ্ট করে রেখেছিল, ঠিক তখনই অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যায় একটা অঘটন। যার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ বিজলীবাতী নিভে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, এক অভাবনীয় বিরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারদিক। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ-হুলোড়, হুড়োহুড়ি, ছোটাছুটি।

এমতবস্থায় জয়ন্তি অন্ধের মতো পথ অনুসরণ করে ব্যাক-ডোর দিয়ে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ির গোড়ায় প্রফেসার শুভেন্দুর সাথে লাগল এক ধাক্কা। বেশ জোরেই লেগেছিল ধাক্কাটা। ছিটকে দু'জনে পড়ল গিয়ে তিনহাত দূরে। কিন্তু অঙ্গ-পতঙ্গের স্পর্শের অনুভূতিতে দুজনারই বোধগম্য হয়েছিল তাদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিটিকে। প্রফেসার শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,-'সরি ম্যাডাম, আই এ্যাম সো সরি! আর ইউ ওকে?'

জয়ন্তি নীরব, নিরুত্তর। অপ্রত্যাশিত প্রফেসার শুভেন্দুর কন্ঠস্বরে ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। যেদিন ও' প্রথম অনুভব করেছিল, পুরুষালী দেহের স্পর্শের এক অভিনব অনুভূতি। কি নিদারুণ সেই অনুভূতি। যা ভাষায় বিশেষণ করা যায় না। সে এক নতুন চেতনা, নতুন অভিজ্ঞতা, সম্পূর্ণ নতুন বিস্ময়। কিন্তু তখন ওর শোচনীয় অবস্থা। হঠাৎ প্রফেসার শুভেন্দুর সংস্পর্শের কোমল অনুভূতিতে তাঁর পুরুষালী দেহের গন্ধ্যে এক ধরণের নেশায় ওকে মাতাল করে তোলে। ইচ্ছে হচ্ছিল, প্রফেসার শুভেন্দুর ঘন পশমাবৃত প্রশস্ত বক্ষপৃষ্ঠে নিজেকে সঁপে দিতে। ওঁর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের বেষ্ঠনে একেবারে পিষ্ট হয়ে যেতে। ওঁর উষ্ণ আলিঙ্গনে লীন হয়ে যেতে। কিন্তু মৌনতা এবং বিমূঢ়তায় একটা শব্দও ওর উচ্চারিত হলো না। নীবরতায় বয়ে গেল বেশ কয়েকটি মুহূর্ত। হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে প্রফেসার শুভেন্দুর দরাজ গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বরে ভ্রমের ঘোর ভাঙ্গতেই লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অন্ধের মতো হাতরে হাতরে বের হবার পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু প্রফেসার শুভেন্দু? ওঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই কি ঘটে নি?

অবশ্যই ঘটেছিল। ক্ষণিকের অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তিতে ক্ষণপূর্বে যে কান্ডটি সেদিন ঘটে গিয়েছিল, মুহূর্তের জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। কিছু বলবার ব্যাকুলতায় প্রচন্ড উদগ্রীব হয়ে উঠছিলেন। অজানা এক আকর্ষণে মনকে বারবার দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কারো নজরে ধরা না পড়লেও আচমকা যুবতী রমণীর কোমল অঙ্গ স্পর্শে প্রফেসার শুভেন্দুর সুকোমল হৃদয়কে কে সেদিন ভিজিয়ে দিয়েছিল, যার মধুর আবেশে তাঁর মধ্যেও যে একধরণের কোমল অনুভূতির জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কে জানতো!

অথচ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। বিপদকালিন সময়ে থমকে যাওয়া কয়েকটি মুহূর্তে উষ্ণ নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসের আনা গোনার মধ্যেই হঠাৎ ঝট্ করে জ্বলে ওঠে বিজলীবাতী। তখন দুজনেই চমকে ওঠে। পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে প্রফেসার শুভেন্দু লক্ষ্য করলেন, স্পর্শকাতরতায় লজ্জাবতী পাতার মতো মাথাটা নূয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল জয়ন্তি। যেদিন ওর পুলক জাগা এক অদ্ভুদ শিহরণে হৃদয়পটভূমি তোলপাড় করে দিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠেছিল ওর হৃদয়স্পন্দন। বার বার ক্ষণপূর্বের স্মৃতি ওকে বিচলিত করে তুলছিল। যেদিন প্রথম দোলা দিয়ে ওঠেছিল ওর মন-প্রাণ সারাশরীর। জাগ্রত হয়েছিল, এক অভিনব অনুভূতি। ক্রমে ক্রমে সিক্ত হয়ে ওঠেছিল, ধূসর মরুভূমির মতো ওর হৃদয়পটভূমি। যেদিন শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম আবিস্কার করে, জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং ভালোবাসার সারমর্ম। মিরাকলের মতোই জেগে ওঠেছিল ওর বেঁচে থাকার সাধ, ভালোবাসার ইচ্ছা, আবেগ-অনুভূতি। যা ক্ষণপূর্বেও কল্পনা করতে পারেনি জয়ন্তি। আর সেদিন থেকেই প্রফেসার শুভেন্দুকে একান্ত আপন করে কাছে পাবার ইচ্ছা ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে।

কিন্তু সূর্য্য কি এতকাল পশ্চিমদিকে উঠেছিল? না আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগুলি সব মেঘে ঢাকা ছিল। না কি বসন্তে ফুলই ফোটেনি বাগিচায়। স্রষ্টার পরিচালনায় সারা বিশ্ব-ব্রক্মান্ডের সবকিছুই রীতিমতো একইভাবেই চলে আসছে। প্রকৃতির রূপ, বৈশিষ্ঠ কিছুই তো বদলায় নি! তবে আজ হৃদয় আঙ্গিনার কেন এমন বিবর্তন জয়ন্তির! কেনইবা এমন অস্থিতিশীলতা! কখনো উচ্ছলতা, কখনো ঔদাসীন্যতা, কখনো মলিনতা, কখনো চঞ্চলতা। পূর্বে কখনো তো এমন ঘটেনি। অথচ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চরম দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ জয়ন্তি, মাতা-পিতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অদূরে পড়ে থাকার বুকভাঙ্গা কষ্ট আর বেদনাগুলিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে একান্তে নিঃভৃতে নির্জনে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকে প্রফেসার শুভেন্দুকে সেই নীরব ভালোলাগার আবেশ ও ভালোবাসার ইচ্ছানুভূতির অবগাহনে।

কিন্তু কতক্ষণ! বাইরের পৃথিবীর বুকে আঁধার নেমে এলেই ওর হৃদয় আকাশেও অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঘুমন্ত শহরের প্রতিটি মানুষ তখন নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হষ্টেলের ছোট ছোট কামরা। একেলা নিঃসঙ্গতায় তখন ওর দম বন্ধ

হয়ে আসে। বড্ড অস্বস্তিবোধ করে। হষ্টেলের রুটিনমাফিক জীবন বড়ই অসহনীয়। আজকাল ওর একঘেঁয়ে লাগে। যেদিন প্রফেসার শুভেন্দুর অমায়িক আন্তরিকতার অভিব্যক্তি এবং তাঁর সান্নিধ্য জয়ন্তিকে পাগল করে তুলেছে, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, সেদিন থেকে হষ্টেলের চার দেওয়ালের ভিতরে ওর মনই আর টিকতে চায়না। অপেক্ষা করে থাকে, কখন রাত পোহাবে, কখন স্নিগ্ধ সতেজ হয়ে ফুটে উঠবে ঊষার প্রথম তরুণ সূর্য্যের কোমল নির্মল আলো। প্রফেসার শুভেন্দুকে আবার কখন দেখতে পাবে।

(তিন)

ঢং ঢং করে ঘড়ির ঘন্টার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় জয়ন্তির। ধড়ফড় করে ওঠে। চোখ মেলে দ্যাখে, সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। পূর্ব দিগন্তের প্রভাতরবির কোমল রক্তিমাভার কণা কৃষ্ণচূড়ার গাছের ফাঁক দিয়ে জানালার পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়েছে ওর বিছানায়। সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। বাইরে ঝুরু ঝুরু মিহিন বাতাস বইছে। গাছের পাতাগুলি এলোপাথারি দুলছে। মনে হচ্ছে যেন রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে। কখনো ছায়া, কখনো প্রখর রৌদ্র। মনটা ওর মুহূর্তে ছুটে চলে যায়, শৈশবে ফেলে আসা আনন্দ-কোলাহল মুখর স্বর্ণালী দিনের সেই অম্লান স্মৃতির মণিমেলায়। চকিতে মনে পড়ে যায়, প্রাইমারী স্কুলে থাকাকালীন একবার ওদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতড়ণী উৎসবে নৃত্যগীতি অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল,-'আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়/ লুকোচুরি খেলা রে ভাই/ লুকোচুরি খেলা।'

সে বছরেই সঙ্গীতে হাতে খড়ি জয়ন্তির। কিন্তু পরবর্তীতে পড়াশোনার চাপে নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা এবং শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার সময় সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। আজ এতকাল পর হঠাৎ ওকে প্রচন্ড উৎসুক্য করে তোলে। ইচ্ছে হচ্ছে, নতুন করে আবার সঙ্গীত চর্চা শুরু করতে, নিয়মিত রেওয়াজ করতে।
মনস্থির করে, পি.এইচ.ডি করেই দেশের স্বনামধন্য বড় বড় ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ শুরু করবে, তালিম নেবে। আর সেই ইচ্ছের তাগিদেই জয়ন্তি তৎক্ষণাৎ সুরের মূর্ছণায় গুন গুন করতে করতে স্বতঃস্ফূর্ত মনে দ্রুত বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। প্রতিদিনকার মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে যোগ ব্যায়াম সেড়ে যথারীতি সাওয়ার নিতে ঢুকে পড়ে বাথ্‌রুমে।
ইতিমধ্যে টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে। জয়ন্তি দ্রুত ছুটে আসে। মনে মনে বলল,-বাব্বা, এই সাত সকালেই টেলিফোন! খুব জরুরী তলব মনে হচ্ছে! কিন্তু করল কে! মামনি নয়তো!

এইভেবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে পুরুষ কণ্ঠস্বর।

-'হ্যালো!'

-'হ্যালো, কে বলছেন!'

-'কংগ্রেজুলেশন্‌স্ জয়ন্তি! আমি শুভেন্দু স্যার বলছি, কেমন আছো!'

নাম শোনামাত্রই বুকটা ধুক্ করে কেঁপে উঠল জয়ন্তির। -কে, শুভেন্দু স্যার! ওকি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে না কি! আশ্চর্য্য, গতকাল সারারাত শুভেন্দু স্যারকেই তো স্বপ্নে দেখেছিল ও'! যেন কতদিনের চেনা, কত ঘনিষ্ঠ, কত আপনজন! যুগলবন্দী প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো কখনো বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে দোলায়িত কৃষ্ণচূড়ার গাছেরপাতার আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া একফালি সূর্য্য কিরণের ছায়ায়, কখনো নির্জন নিরিবিলিতে পুস্প বাগিচার সবুজ মখমলে ঘাসের প'রে হাতে কুলফি নিয়ে পাশাপাশি দুজনে বসে, সবুজ মনের দ্বীপ্তি জাগিয়ে, স্রোতস্নিনি নদীর মতো খুশীর পাল তুলে সেই কত কথা, কথার আলাপন, কত হাসি-কলোতান স্যারের সাথে। শেষ হয়েও হয় না শেষ। চারদিক নীরব, গাঢ় নিস্তদ্ধ। দিগন্তবিস্তৃত রেশমী জোছনার মায়াবী সম্মোহনে স্বপ্নাপ্লুত হয়ে অতন্দ্র মায়াবী রাতের মোহময় ভালোলাগা আর ভালোবাসার বিশাল উপত্যকার মাঝে তন্ময় হয়ে দুজনেই ডুবে যায় হৃদয়-মন-প্রাণ শীতল করা সেই নির্জন নিস্তদ্ধতার গভীরে। আবার কখনো হিন্দি ছবির রোমান্টিক নায়কদের মতো উচ্ছাসে উতলা হয়ে মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি মেলে আস্বাদন করতে থাকে, সৌন্দর্য্যের পারিজাত, চির

অম্লান, চির সজীব, শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমণীয় এক উদ্বিগ্ন যৌবনা সম্পন্না অনন্যা, প্রেমের মহিমায় দ্বীপ্ত, মমতাময়ী বিদূষী রমণী জয়ন্তির বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল যৌবনের চমকপ্রদ রূপ। যেন তাঁর স্বপ্নের রাজকুমারী। চোখের পলক পড়েনা। বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত। তবুও যেন আঁশ মেটেনা স্যারের। বেমালুম পোহায়ে যায়, আত্ম মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রাখা বিনিদ্র রজনীর কত অগণিত প্রহর। তার রেশ যেন এখনো কাটেনি। এখনো স্পষ্ট জীবন্ত হয়ে ভাসছে ওর দু'চোখের পাতায়।

একেই বলে সংযোগ। এক অদৃশ্য আকর্ষণ। তবু নিজের কানদুটোকে কিছুতেই বিশ্বাস হয়না জয়ন্তির। বিস্ময় আর খুশীর সংমিশ্রণে মুহূর্তের জন্য ও' অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ থেমে একটা ঢোক গিলে ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বলল,-'কি, কি ব্যাপার স্যার! ভালো আছেন আপনি!'

ওর গলার আওয়াজ খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হতেই প্রফেসার শুভেন্দু তক্ষুণিই পাল্টা প্রশ্ন করলেন,-'শরীর খারাপ না কি জয়ন্তি? আর ইউ ও.কে?'

শুনে থ্ হয়ে যায় জয়ন্তি। আশ্চর্য্য, ওঁর কণ্ঠে কি আবেগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা! যেন কতদিনের সম্পর্ক! কত আপনজন! বিশ্বাসই হয় না! পরক্ষণেই উচ্ছাসিত কণ্ঠে বলল,-'নো স্যার, ডোন্ট ওরি! আই এ্যাম ও.কে! টেল মী, হোয়াট ইস্ দ্যা নিউজ?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রফেসার শুভেন্দু বললেন,-'আমি ভালো আছি জয়ন্তি! ভাবলাম, শুভ সংবাদটি তোমায় এবার দিয়েই দিই!'

কিন্তু শুভ সংবাদটি যে কি, তা আর বোঝার অপেক্ষা রাখে না জয়ন্তি। তৎক্ষণাৎই সীমাহীন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তবু স্যারের মুখ থেকে শুভ সংবাদটি শোনবার ইচ্ছাটুকু কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না। অনবগত হয়ে খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল,-'কি সংবাদ স্যার?'

সহাস্যে প্রফেসার শুভেন্দু বললেন,-'আই এ্যাম ভেরী গ্যাল্ড্ টু সে, ছাত্রীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই ইন্টেলিজেন্ট্, ব্রিলিয়ান্ট এ্যান্ড সিন্সিয়ার। উই নো এ্যান্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর দ্যাট, ইউ উড্ উইন এ্যান্ড সাক্সেস ইন ইওর লাইফ্। প্রিন্সিপাল সাক্সেনার রিকমেন্ডেই তোমার স্কলারশীপ্ গ্রান্ড হয়ে গিয়েছে। তুমি খুব শীঘ্রই রসায়ন বিজ্ঞানে পি.এইচ্.ডি করতে বিলেত যাচ্ছো জয়ন্তি! উই আর সো প্রাউড অফ্ ইউ। এভ্রিথিং হ্যাজ বিন্ কন্ফার্মড্। বি রেডি নাও। সি ইউ, বাই।'

মুহূর্তে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল জয়ন্তির। অব্যক্ত আনন্দে স্পীচ্লেস হয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও ওর কানে বাজে, ক্ষণপূর্বের টেলিফোনে অন্তরঙ্গ আলাপনের প্রফেসার শুভেন্দুর আবেগপ্রবণ পুরুষালী কণ্ঠস্বর। ছড়িয়ে পড়ে মস্তিস্কের কোষে কোষে। প্রতিবিম্বের মতো ধীরে ধীরে ওর মনঃশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, চড়ুইভাতির অন্যতম আনন্দের সেই দৃশ্যপটের একখন্ড অম্লান স্মৃতি আর স্যারের সাথে একলা নির্জনে গহীন অন্ধকারে যুগলবন্দী হয়ে থাকার কয়েকটি মুহূর্ত। যা কখনো ভোলার নয়। একদিকে বিদেশ যাত্রার অসীম আনন্দ, উল্লাস, অন্যদিকে ইউনিভার্সিটির বন্ধু-বান্ধব সকলের সান্নিধ্য থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবার বিচ্ছেদ-বেদনা। স্পেশালী প্রফেসার শুভেন্দুকে। যাকে ও' মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। যে ওর সবার চেয়ে আপনজন।

কথাটা মনে হতেই বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল জয়ন্তির। অনুভব করে এক ধরণের কোমল বেদনামায় অনুভূতির তীব্র জাগরণ। রক্তের স্রোতের মতো ক্রমশ শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিতে সঞ্চালণ হতে থাকে। শিথিল হয়ে আসে সারাশরীর। হাত-পাগুলিওসব কেমন অসার হয়ে আসছে। কোনো শক্তিই নেই ওর শরীরে। রিসিভারটা কোনরকমে রেখে বিমূঢ়-ম্লান হয়ে ধপাস করে বসে পড়ে সোফায়। উষার প্রথম প্রহর পেরিয়ে আচমকা আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে বিষন্নতায় ছেয়ে যায় ওর শরীর আর মন। উদ্দেশ্যহীনভাবে পলকহীন নেত্রে শূন্যের মাঝে চেয়ে থাকে। তন্ময় হয়ে ডুবে যায়। হঠাৎ জানালার বাহিরে করুণ সুরের মূর্ছণায় একটি ছোট্ট পাখী কাতর কণ্ঠে ডেকে উঠতেই চমকে ওঠে। চেয়ে দ্যাখে, বিরামহীন স্নিগ্ধ বাতাসে দোলায়িত একটি বিশাল পাইনগাছের ডালে বসে সাথীহারা পাখীটি একেলা নিঃসঙ্গতায় ক্রমশ অস্থীর হয়ে উঠছে। চকিতে মনের আঙ্গিনায় এক অদ্ভুদ নীরব নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় জয়ন্তির। যা ওর মনকে করে দেয় গভীর নিমগ্ন, উদাসীন। অথচ তা কত বেদনাদায়ক, কত হৃদয়বিদারক। তবু এ যেন বর্ণনাহীন এক অনবদ্য ভালোলাগার অনন্ত গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। যা দৃষ্টিগোচর না হলে জয়ন্তির কখনোই মালুম হতো না, মনুষ্য জীবনে একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা কত দুর্বিসহ, কতখানি মর্মান্তিক, কত কষ্টকর। যখন বিরহকাতর মানুষ একান্ত আপন জনকে হারিয়ে একেলা নির্জনে নির্বাসিত জীবন যাপন করে।

মনে মনে বড্ড অস্বস্তিবোধ করে জয়ন্তি। অস্থীর হয়ে ওঠে। হঠাৎ কক্ষচ্যুত উল্কার মতো হস্টেল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে আসে রোজ-গার্ডেনে। উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে মন-প্রাণ শীতল করা প্রকৃতির বিশুদ্ধ বাতাসে দাঁড়িয়েও ওর সারাশরীর ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে। ঘেমে একেবারে চুপসে গেছে গায়ের জামা-কাপড়। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে একটি বেঞ্চিতে গিয়ে চুপটি করে বসে পড়ে। ভিতরে ভিতরে টের পায়, ওর মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন।

অথচ কয়েকমাস আগেও প্রফেসার শুভেন্দু ছিলেন জয়ন্তির সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, অপরিচিত একজন অজ্ঞাত কূলশীল ব্যক্তি। যিনি রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষক। সারাদিনের বেশীরভাগ সময় ল্যাব্রোটারীতে পড়ে থাকেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। একাগ্রহে নিমগ্ন হয়ে রির্সাচ করেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কখনো তাঁর কর্ণগোচর হবেনা। ওঁর নাগাল পাওয়া বড়ই দুস্কর। পাবার সম্ভাবনাও নেই। আর পেলেই বা, প্রফেসার শুভেন্দু ওর হয় কে? ওঁর সাথে সম্পর্কই বা কিসের? ওঁর প্রতি আকর্ষণই কিসের? একজন শিক্ষক আর ছাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যেটুকু থাকা প্রয়োজন, সেটুকুই। এর বাইরে তেমনভাবে আলাপচারিতা তো দূর, ওর মনের মধ্যে সেরূপ চেতনাও আগে কখনোও উদয় হয়নি। কিন্তু আজ এ কি ঘটে গেল জয়ন্তির জীবনে। ইট্ ইস্ আনথিংকেবল! ইমপসিবল! আন্‌বিলিভএব্‌ল!

আসলে, মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। শতচেষ্টা করেও পোষ মানানো যায়না। নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতো কখন যে হৃদয়-মন -প্রাণ দোলা দিয়ে উঠে, মনকে ধাবিত করে, বোঝা মুশকিল। যখন হৃদয় নামক মন ভোমরা কোনো এক নির্দিষ্ট বাগিচায় উড়ে গিয়ে বসে। তদ্রুপ প্রফেসার শুভেন্দুর সংস্পর্শে যাবার পর থেকেই একটা মুহূর্তও আর স্বস্তি পায় না জয়ন্তি। রাতেও ঘুমোতে পারে না। দু'চোখ বন্ধ করলেই অদ্ভুদ এক শিহরণে শিহরিত হয় ওর সারাশরীর। জাগ্রত হয়, অত্যাশ্চর্য্যময় এক অভিনব অনুভূতি। যার নাম ভালোবাসা। যার কোনো বিকল্প হয় না। যা হিসেবের দাড়িপাল্লায় কখনোই মাপা যায় না। যার নির্দিষ্ট কোনো ওজন নেই। সীমা নেই।

(চার)

হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল জয়ন্তি। ওর হৃদয় প্রাঙ্গনে ভর করে বসলো প্রেম নামক এক ভূত। কারণে অকারণে প্রফেসার শুভেন্দুর সন্নিকটে যাবার সুযোগগুলিকে ক্রমে ক্রমে সদ্‌ব্যবহার করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। কিন্তু পারেনি, নিলর্জ্জ বেহায়ার মতো ইউনিভার্সিটির নির্জন নিরিবিলির অলিতে-গলিতে ধর্ণা দিয়ে শুভেন্দু স্যারের মনের ঠিকানা খুঁজে বের করতে, তাঁকে বিভ্রান্ত করতে। তাঁর পথ অবরোধ করতে। পারেনি, ছলনাময়ী মেয়েদের মতো বিচিত্র মুখাবয়বে এবং অঙ্গ-পতঙ্গের নানান ভঙ্গিমায় মনের ভাব প্রকাশ করতে, ভালোবাসার সংকেত প্রেরণ করতে।

অগত্যা, নিজের আবেগ-ইচ্ছা-অনুভূতিকে অন্তরের অন্তঃপুরে পুষে রেখে গহীন অনুভূতি দিয়ে দৃঢ়ভাবে শুধু এটুকুই উপলব্ধি করেছিল, অতীতে মায়ের উদৃত ভবিষ্যৎবাণী নিতান্তই বাস্তব সত্য। মানুষ সত্যিই ভালোবাসার পূজারী। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে বসন্ত ঋতুতে বাগিচায় যেমন ফুল ফোটে, তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়পটেও জন্ম নেয় ভক্তি-শ্রদ্ধা-আদর-স্নেহ-মমতা এবং ভালোবাসা। পৃথিবীর সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি যে ধারণা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে পুষে রেখেছিল, তা সম্পূর্ণ ভুল, মিথ্যে। আর সেই মিথ্যে আবরণ মনের মণিকোটা থেকে সড়ে যেতেই জয়ন্তির সুকোমল হৃদয়পটভূমিতে জন্ম নেয় আদর-স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা। সী ইস্ ইন লাভ।

অবলীলায় প্রফেসার শুভেন্দুকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে জয়ন্তি। হ্যাঁ, প্রফেসার শুভেন্দুকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে জয়ন্তি। প্রেম যমুনার অতল তলে ও' হাবুডুবু খাচ্ছে। কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ এর কিইবা মূল্য আছে। এ তো সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন, ভিত্তিহীন, অর্থহীন। অহেতুক বিড়ম্বণা। অবুজ মনের মিথ্যে চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা। অযথা নিজেকে কষ্ট দেওয়া।

অবশেষে নিজের ইগোর কাছে পরাস্ত হয়ে সংকল্পচ্যুত এবং আবেগ-অনুভূতিহীন জয়ন্তির নিরস নিস্প্রেম হৃদয়ে যে অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্ম নিয়েছিল, তা অঙ্কুর হয়ে গজিয়ে ওঠার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জয়ন্তি পারে নি, তা বাঁচিয়ে রাখতে, ওর

হৃদয়পটে ধারণ করতে। আর সেই অপারগতা এবং ব্যর্থতার কারণে একরাশ মনবেদনা নিয়ে জয়ন্তি অচীরেই পৌঁছে যায়, ওর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দেশ লন্ডন, ইংল্যান্ড। যেদিন স্কলারশীপ্‌ নিয়ে রসায়ন বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করতে বিদেশ যাত্রার শুভমুহূর্তে প্রফেসার শুভেন্দু একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে ওকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন শহরের আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে। অপ্রত্যাশিত যার দর্শণে এবং আগমনে নিবিড়তম আনন্দে ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় একটি শব্দও জয়ন্তি উচ্চারণ করতে পারেনি। পারেনি, নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে। পারেনি, ভালোবাসা নামে চিরসত্য ও পবিত্র শব্দটি মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে। বার বার একধরণের শূন্যতায় বুকটা ওর হাহাকার করে উঠছিল। যখন মনের অগোচরেই অব্যক্ত কষ্ট বেদনাগুলি ওর তরল হয়ে দু'চোখর কোণায় চিক্‌ চিক্‌ করে উঠেছিল। তবু সাহসে কূলোয় নি নিজেকে ধরা দিতে।
অগত্যা, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে মনে মনে ভাবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের নিমেষে আকাশ পাড়ের দূর নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হয়তো জীবনে আর কোনদিনও দেখা হবে না। হবার সম্ভাবনাও নেই। জীবনে চলার পথে ক্ষণিকের সীমাহীন সঞ্চিত ভালোলাগা আর ভালোবাসাটুকুই শুধু রয়ে যাবে ওর স্মৃতির গ্রন্থিতে, অদৃশ্য এক অনুভূতিতে।

অথচ মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধানে প্রফেসার শুভেন্দু দাঁড়িয়েছিলেন। সপ্রশংস দৃষ্টি হেনে অস্ফূট স্বরে শুধু বলেছিলেন, -'আমরা আশাবাদী জয়ন্তি। উর্ত্তীণ তুমি হবেই! ভালো থেকো।'

ইতিপূর্বে জয়ন্তির গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই ছাপা অক্ষরের মতো ওর না বলা কথাগুলি সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। আর তৎক্ষণাৎ মুহূর্তের জন্য কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন প্রফেসার শুভেন্দু। মনকে দুর্বল করে দিলেও এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না। -'ও.কে জয়ন্তি, বেষ্ট অফ্‌ লাখ। টেক্‌ কেয়ার।' বলে অবিলম্বে বিমান বন্দর থেকে প্রস্থান করলেন।

জয়ন্তি নীরব, নির্বিকার। অসহায় ওর চোখের চাহনি। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে প্রফেসার শুভেন্দুকে যতক্ষণ দেখা গিয়েছিল, বিষন্ন দৃষ্টি মেলে সেদিকেই তাকিয়েছিল। হঠাৎ চোখের আড়াল হতেই নিজেকে শান্তনা দিয়ে মনে মনে বলল, একান্তে নিঃভৃতে নিবিড় করে নাই বা পেলাম, তবু আভিজাত্যসম্পন্ন এবং মার্জিত পুরুষ শুভেন্দু স্যারের অকৃত্রিম হাসির অম্লান স্মৃতিটুকুই নয় চিরদিন জড়িয়ে থাকবে ওর অনুভূতিতে। এও কি কম! এ কি কম পাওয়া! এ তো ভাবাই যায় না! কল্পনারও অতীত! কিন্তু কতদিন! লন্ডনে পৌঁছেই হয়তো নানান ব্যস্ততায় ধীরে ধীরে ভুলে যাবে প্রফেসার শুভেন্দুকে। বেমালুম ভুলে যাবে ওর অতীতকে। একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে সব মুছে যাবে ওর স্মৃতির পাতা থেকে।

কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ইংল্যান্ড পৌঁছেও জয়ন্তি পারে নি প্রফেসার শুভেন্দুকে ওর হৃদয় থেকে অপসারিত করতে, তাঁকে ভুলে যেতে। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দিনের শেষে একখন্ড অবসরে গভীর তন্ময় হয়ে বিচরণ করে, ওর মনগড়া এক স্বপ্নলোকে, এক নতুন পৃথিবীতে। যেখানে শুধু ওরা দুজনেই একমাত্র বাসিন্দা। ততক্ষণে পশ্চিম দিগন্তবিস্তৃত উজ্জ্বল রেশমী জোছনার আলোয় আবির্ভূত হয় পূর্ণিমার চাঁদ। আর সেই জোৎস্না রাতের উজ্জ্বল আলোয় শহরের সমস্ত কানন যখন অপরূপভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে, বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের সুগন্ধ্যে নিমজ্জিত জয়ন্তি তখন ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে অনুভব করে, ওর সুকোমল মসৃণ অঙ্গে মৃদুস্পর্শে কার যেন হস্ত সঞ্চালণ হচ্ছে। শুনতে পায় ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ। কে যেন কি বলছে কানে কানে। ক্রমশই যেন সেই শব্দ আর সেই নিদারুণ এক কোমল অনুভূতি ওর শরীরের সাথে লীন হতে থাকে। জয়ন্তি দুচোখ বন্ধ করে, উন্মুক্ত অন্তর মেলে নিমগ্ন হয়ে আস্বাদন করতে থাকে, ক্ষণিকের সঞ্চিত সেই ভালোলাগার মধুর আবেশ। ছুঁয়ে যায় ওর হৃদয়পটভূমি। শিহরিত হয় সারাশরীর। রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠস্বর। না জানি কতক্ষণ!

এমনি করেই নীরব গাঢ় নিস্তব্ধতায় পোহায়ে যায় কত অগণিত প্রহর। ততক্ষণে নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে ঢলে পড়ে আকাশ বাতাস গোটা পৃথিবী। গভীর নিশুতি রাত। ঘুমন্ত শহর। চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে চেয়ে দ্যাখে, পশ্চিম প্রান্তর জুড়ে নীলাভ জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আর সেই দিগন্ত বিস্তৃত জ্যোৎস্নার মধ্যেই ক্রমশ জীবন্ত হয়ে ওঠে, প্রফেসার শুভেন্দুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখমন্ডল। ক্ষীণ শব্দে কর্ণগোচর হয়, তাঁর দরাজ পুরুষালী কণ্ঠস্বর। তিনি ধীর ধীরে ওর অতি সন্নিকটে এগিয়ে আসেন। নিঃসংকোচে মধুর প্রেম-আহ্বানে সম্মুখে প্রসারিত করে দিলেন তাঁর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়। ধুক্‌ধুক্‌ করে বুক কেঁপে ওঠে জয়ন্তির, ঠোঁট কেঁপে ওঠে। ততক্ষণে লজ্জাবতী কনের মতো একহাত ঘোমটার আড়ালে চমকিত জয়ন্তি শ্বাশত লজ্জায় নূয়ে পড়ে, ঘন পশমাবৃত প্রফেসার শুভেন্দুর উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে।

তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় জয়ন্তির। চোখ মেলে দ্যাখে, ও' একা শুয়ে আছে বিছানায়। আশে-পাশে কেউ নেই। সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বেলা দশটা বাজে। রুটিনমাফিক শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যস্তময় প্রাত্যহিক জন জীবন, যানবাহন। তবে কি এতক্ষণ সব স্বপ্ন দেখছিল জয়ন্তি!

মায়ের মুখে শুনেছে, ভোর বেলার স্বপ্ন কখনো বিফলে যায়না। অন্তত কিছুটা হলেও বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাই বা সম্ভব হবে কেমন করে! নেভার, ইম্পসিবল্! প্রফেসার শুভেন্দু কখনোই এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন নি! ওর মুখের দিকে কখনো চোখ তুলে চেয়ে দ্যাখেন নি! ছাত্রীদের সাথে কখনো হাসি-ঠাট্টাও করেন নি! তা'হলে কেন এমন স্বপ্ন দেখা? কেনই বা ওঁর প্রতি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে নিজের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা? নিজেকে কষ্ট দেওয়া? কিসের মোহে এ মায়া মরীচিকা ছল্? কেন? কিসের জন্যে? সবই কি শুধু মনের ভ্রম?

স্বাভাবিক কারণে মনটা হঠাৎ বিষন্নতায় ছেয়ে যায় জয়ন্তির। উঠতেই ইচ্ছে করছে না বিছানা ছেড়ে। আর উঠেই বা করবে কি! অল্ এ্যাক্সজামিনস্ হ্যাজ বিন ডান। শুধু রেজাল্ট আউটের অপেক্ষা মাত্র। এখনো সপ্তা দুয়েক বাকী। কিন্তু হঠাৎ প্ল্যান প্রোগ্রাম সব কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল জয়ন্তির। মনস্থির করে, আগামী সপ্তাহেই দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানে যে একটি সারপ্রাইজ্ নিউজ ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

সিদ্ধান্ত মতোই যথারীতি উড়ো জাহাজ থেকে বিমান বন্দরে অবতড়ণ করে, চেকিং সেড়ে করিডোর দিয়ে বের হতেই ভুত দেখার মতো চমকে ওঠে। বুকটা ধরাস্ করে ওঠে জয়ন্তির। হৃদস্পন্দনও আরো দ্রুতগতীতে চলতে শুরু করে।-এ কি, শুভেন্দু স্যার্ যে! ওঃ মাই গড্! উনি এইখানে? কি করছেন? উনিও কি কাউকে রিসিভ করতে এসেছেন বুঝি! কি আশ্চর্য্য! এ তো ভাবাই না! এ যে স্বপ্নেরও অতীত!

ইতিপূর্বে সকৌতুক হাস্যে দ্রুত এগিয়ে আসে ছোটবোন মধুবন্তী। হবু জামাইবাবু শুভেন্দুর হাত ধরে বলে,-'শুভষ্য শীঘ্রম দিদি! কে এসেছে দ্যাখ্! চিনতে পারছিস? তোর মনের মানুষটাকেই নিয়ে এসেছি সঙ্গে! সারপ্রাইজটা কেমন দিলাম বল্ তো!'

যেন আকাশ থেকে পড়ল জয়ন্তি। চোখেমুখে ওর অপার বিস্ময়। বিস্ময়ে একেবারে থ্ হয়ে যায়। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ে না। বড় বড় চোখ মেলে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এখনো কি স্বপ্ন দেখছে না কি ও'! নিজের শরীরে একটা চিমটি কেটে মনে মনে বলে,-হোয়াট এ সারপ্রাইজ বন্তী! এ যে আনবিলিভএ্যবল্, আনথিংকেবল!

বিস্ময়ে এতোটাই অভিভূত হয়ে পড়ল, মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তির কণ্ঠস্বর। হঠাৎ সশব্দে বলে উঠল,-'মানে! হোয়াট ডু ইউ মিন বন্তী? আর ইউ যোকিং? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!'

হাতের কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মেরে মধুবন্তী বলল,-'হুঁমঃ, ন্যাকা! কিছুই বুঝতে পারছে না! ডুবে ডুবে জল খেয়ে...!'

ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠতেই হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল জয়ন্তির। মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সকলের সম্মুখে প্রেষ্টিজটা পাঞ্চার হয়ে যাবার ভয়ে মাথাটা ওর একেবারে হেট্ হয়ে যায়। মনে মনে অপদস্থ হয়। অস্বস্তিবোধ করে। অত্যন্ত লজ্জিত হয়। চোখ তুলে তাকাতেই পারেনা। পড়ে যায় বিপাকে। একটু সড়ে এসে মধুবন্তীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে,-'ননসেন্স, এসব কি হচ্ছে বন্তী! ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!'

একটু দূরে প্রসন্ন চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুধাময়ী। উচ্ছাসিত আনন্দে তিনি একেবারে আটখানা। জয়ন্তির সন্নিকটে এগিয়ে আসেন। উৎফুল্ল হয়ে বললেন,-'শুভেন্দু স্বয়ং নিজে এসে প্রোপোস করেছে। সম্ভ্রান্ত পরিবার। পিতা স্বনামধন্য শ্রী শশাঙ্ক মুখুজ্জ্যে। যিনি দিল্লীর মেডিক্যাল কলেজের ডিন। মাতা শ্রীমতি মৃনময়ী দেবী। ওনারা দুজনেই সঙ্গে এসেছিলেন। ওনাদের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র শুভেন্দু, বংশের প্রতীক, একমাত্র উত্তরাধিকারী। ছোট্ট নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। সংসারে কোনো ঝামেলা নেই। যেমনটি আমি চেয়েছিলাম। আজ সকালেই শুভেন্দু ফোন করেছিল। তুমি আসছ জেনে ওকে বন্তীই জবরদস্তী নিয়ে এসেছে সঙ্গে।'

একগাল হেসে ফিস্ ফিস্ করে বন্তী বলল,-'হী ইস্ এ ভেরী নাইস্ পার্সন দিদি! ভেরী হ্যান্ড্সাম্ এ্যান্ড্ গুড্ লুকিং! ইউ আর সো লাকি!'

ততক্ষণে জয়ন্তির সন্নিকটে এগিয়ে আসেন প্রফেসার শুভেন্দু। মৃদু হেসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,-'হাউ আর ইউ জয়ন্তি? পথে কোনো অসুবিধে হয় নি তো!'

তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি জয়ন্তির। হঠাৎ প্রফেসার শুভেন্দুর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। একটা শব্দও আর উচ্চারিত হয় না। ওর স্বপ্নের মতো মনে হয়। কিছুতেই বিশ্বাস হয়না। আচমকা অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদে মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল যেন আকাশের চাঁদটাই বুঝি পেয়ে গিয়েছে হাতে। যা স্বপ্নেও কল্পনা যায় না।

ততক্ষণে হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে ধেয়ে আসে খুশীর বন্যা। পারে না নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। শ্বাশত লজ্জায় মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাবার চেষ্টা করলেও মনের অগোচরেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চোখের তারাদু'টিতে অব্যক্ত খুশীর একটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু উড়ো জাহাজ থেকে অবতরণ করে নিজের মাতৃভূমিতে পর্দাপণ করতেই আচমকা মিরাকলের মতো জীবনটা যে একেবারে এতখানি বদলে যাবে, তা কখনোই ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি, ওর একান্ত ভালোবাসার মানুষটিকেই এতো শীঘ্রই, এতো অনায়াসে একান্ত আপন করে কাছে পাবে।

অপ্রত্যাশিত একরাশ আনন্দ আর লজ্জার সংমিশ্রণে চোখমুখ উজ্জ্বল দ্বীপ্তিময় হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সবার অলক্ষ্যে প্রফেসার শুভেন্দুর দৃষ্টি বিনিময় হতেই স্পর্শকাতর লজ্জাবতী পাতার মতো চকিতে রাঙা মুখখানি নূয়ে পড়ে জয়ন্তির। ভিতরে ভিতরে অসীম আনন্দে শিশির বিন্দুর মতো অশ্রুকণায় চোখদু'টো ওর চিক্চিক্ করে ওঠে। ঠোঁটের কোণে অস্ফুট হাসির একটা রেখা ফুটিয়ে বলল, -'আই কান্ট বিলিভ ইট্ মাম্! আই কান্ট বিলিভ! ইউ আর গ্রেট্! আই লাভ ইউ মাম্! আই লাভ ইউ!'

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরোন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com